দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

রাস্তায় ধুলো ওড়ে। ঘরের মধ্যের ধুলো দেখেছ? রাতে টর্চের আলো দিয়ে দেখা যায়। দিনে দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়লেও ধুলো দেখা যায়। নানাভাবে দেখো। কোথায় কীভাবে দেখেছ তা লেখো আর আঁকো :

কখন ঘরের ধুলো দেখেছ	কীভাবে দেখেছ, ছবি এঁকে দেখাও	কোন সময় বেশি ধুলো দেখেছ

মেঘ-বৃষ্টি-বাজ

মেঘ নিয়ে
কথা হতে
হতেই সত্যিই
বৃষ্টি এল।
বিদ্যুতের চমক
আর কড় কড়
শব্দে বাজ পড়া
শুরু হলো।
ক্লাসে সবাই
নড়েচড়ে বসল।
ঋতু বলল— দিদি
বাজ পড়ে কেন?
নবীন বলল---
মেঘে মেঘে ঘষা

লাগে। আগুন বেরোয়।

সুজন বলল— সে কী করে হবে? মেঘ কী পাথর নাকি? মেঘ তো আসলে জলের ছোটো ছোটো কণা! তাতে কী করে ঘষা লাগবে?

সাবিনা বলল— একটা কাক উড়ে ইলেকট্রিক লাইনের দুটো তারের মাঝে গিয়েছিল। জোর শব্দ হলো। আর কী আলো! কাকটা মরে গেল। সেদিন আমার খুব মনখারাপ হয়েছিল।

— বাজ পড়া আসলে ওইরকম। মেঘের একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় বিদ্যুৎ যায়। তাতে আলোর ঝলক দেখা যায়। তখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ থেকে মাটিতে বিদ্যুৎ গেলে আমরা বলি বাজ পড়ল।

কৃষ্ণা বলল— দিদি, নারকেল আর তালগাছের ওপরেই কেন বাজ পড়ে?

— ওগুলো উঁচু গাছ। ওদের মাথাগুলো মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে। তার মানে, অন্যান্য গাছের তুলনায় মেঘের একটু কাছে থাকে।

সুজন বলল - মেঘের কাছে বলেই উঁচু গাছের মাথায় বাজ পড়ে!

তিন্নি বলল— একবার বাজ পড়ে আমাদের একটা নারকেল গাছ মরে গেছিল। তার গুঁড়ি দিয়ে আমাদের পুকুরঘাট বাঁধানো হয়েছে।

— অনেকেই তাই করেন। এমনিতে এসব গাছ কেউ কাটে না। বাজ পড়ে গাছ মরে গেলে কিছু করার থাকে না। তখন গাছটা ফেলে না দিয়ে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লে সে বিষয়ে জেনে নিয়ে নীচে লেখো :

কোথায় বাজ পড়েছে	কখন (বৃষ্টির আগে, না বৃষ্টির সময়, নাকি পরে)	তাতে কাদের কী ক্ষতি হয়েছে

আকাশে রং-এর ছটা

বৃষ্টি থামার পর ছুটি হলো। বাড়ির পথে চলল সবাই। আবার একটু রোদ উঠল। হঠাৎ করিম দেখল, আকাশে যেন অনেকগুলো রং সাজানো রয়েছে। বলল— ওই দেখ, আকাশ কত রং সাজিয়ে রেখেছে। সবাই দেখল।

রেখা বলল— কী কী রং আছে বল দেখি?

সবাই মিলে গুনতে শুরু করল। গোনার পর রংয়ের সংখ্যা নিয়ে নানাজনের নানা মত।

— চারটে রং। নীল, সবুজ, হলুদ আর লাল।

— নীলের আগে একটু বেগুনি আভা দেখছিস না? পাঁচটা রং।

পরদিন সবাই মিলে ক্লাসে আকাশে রংয়ের ছটার কথা বলল।

দিদিমণি বললেন— চার-পাঁচটা রং মনে হয়েছে? দূর থেকে ভালোই দেখেছ! তবে ওই নীলের দুটো ভাগ আছে। একটু গাঢ়, আর একটু হালকা। এমনিতে আকাশ ওইরকম হালকা নীল দেখায়। তাই ওই রংটাকে বলে আকাশি।

রিম্পা বলল— তাহলে মোট ছ-টা রং?

— খুব ভালো করে দেখলে হলুদ আর লালের মাঝে একটা

কমলা রং দেখা যায়। তাই আমরা বলি মোট সাতটা রং।

— বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল ?

— ঠিক ! রংগুলোর নামের প্রথম বর্ণগুলো পরপর লেখো তো।

সবাই খাতায় লিখল— **বে নী আ স হ ক লা।**

তনিমা বলল— আচ্ছা দিদি, খানিক পরেই রংগুলো মিলিয়ে গেল কেন?

— ওগুলো আসলে ছোটো ছোটো জলের ফোঁটার জন্য তৈরি হয়। জলের ফোঁটাগুলো যেই বাষ্প হয়ে যায় তখনই রংগুলো মিলিয়ে যায়।

করিম অবাক হয়ে বলল— জলের ফোঁটা?

— হ্যাঁ। ছোটো ছোটো জলের ফোঁটার উপর সূর্যের আলো পড়ে। এক একটা ফোঁটা থেকে এক এক রংয়ের আলো চোখে আসে। যে ফোঁটা থেকে যে রংয়ের আলো আসে সেটা সেই রংয়ের দেখায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আকাশে রংয়ের ছটা দেখেছ? কেমন দেখতে, আঁকো।
তুমি কোথায় ছিলে, সূর্য কোথায় ছিল তাও আঁকো:

মিশল আকাশ মাটির পরে

ছুটির দিন। পিনাকী মামার বাড়ি যাচ্ছিল। মামার সঙ্গে। হেঁটে গেলে কম পথ। বড়ো মাঠটা পেরোলেই পৌঁছে যাবে। দু-জনে ঠিক করল হেঁটেই যাবে। মাঠটার কাছে

এসে পিনাকী দূরে তাকাল। মাঠের ওপারে আকাশটা কি গাছের মাথায় মিশে গেছে! মামাকে জিজ্ঞেস করল। মামা হেসে বললেন— চলো, ওখানে গেলেই দেখা যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা মামার বাড়ির গাঁয়ে পৌঁছে গেল।

মামা বললেন— দেখো তো, আকাশটা কোথায়?

পিনাকী দেখল আকাশটা আগের মতোই অনেক উঁচুতে। বুঝতে না পেরে মামার দিকে তাকাল।

মামা বললেন— চলো, আমাদের বাড়ির পাশেই তো মাঠ। সেখানে গিয়ে আবার দেখবে আকাশটা কোথায়!

মামার বাড়ির কাছে পৌঁছে পিনাকী একাই মাঠের ধারে গেল। মাঠের ওপারের আকাশ এখানেও মিশেছে মাটিতে!

পরদিন স্কুলে এইসব কথা বলল পিনাকী।

তনিমা বলল— আমিও দেখেছি। পিসির বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখেছি।

দিদিমণি বললেন— ফাঁকা জায়গায় গেলেই এমন দেখা যাবে।

— দিদি, দূরের ওই জায়গাটাকে কী বলে?

— দিগন্তরেখা। দিকচক্ররেখা। এইসব নাম আছে।

মৌলি বলল— দিদি, দিগন্তরেখা কত দূরে হয়?

— ফাঁকা জায়গাটা যত বড়ো হবে দিগন্তরেখা তত দূরে চলে যাবে। আকাশটা মাটির বেশি কাছে মিশেছে মনে হবে।

আয়ুব বলল— আমাদের বাড়ির পিছনে সারি সারি গাছ। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে তাকালে মনে হয় যেন গাছগুলো অনেক দূরে গিয়ে আকাশে মিশে গেছে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নীচে একটা মাঠ আর মাঠের পারে দিগন্তরেখা আঁকো:

পাহাড়ে চড়ার মজা

দিদিমিণির সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গেছে ছেলেমেয়েরা। তরতর করে উঠে যাচ্ছে রতন, ইলিয়াস, রাবেয়া, তিতলি, জেমসরা। দিদিমণি ওদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। তিতলি একটা বাঁকের পিছনে গিয়ে ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল। তাকে না দেখে রতন বলল— তিতলি কই?

ইলিয়াস তাকে খুঁজতে ছুটল। অনেকটা এগিয়েও তিতলিকে পেল না। এবার পিছন থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল তিতলি। বলল— ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার তাকালি না? আমি তো লুকিয়েছিলাম।

ঘণ্টাখানেক ধরে হইহই হলো। তারপর সবাই নামতে শুরু করল। রিমঝিম আর মিঠাই আস্তে আস্তে নামল।

জেমস বলল— পাহাড়ে চড়া খুব মজার! আবার একদিন আসব।

রিমরিম খুব রোগা। সে হাঁপাচ্ছিল। বলল — আমি স্বাস্থ্যটা ভালো করে ফেলব। পরেরবার আর হাঁপাব না।

মিঠাই খুব মোটা। সে বলল আমি খাওয়া-দাওয়া বদলে ফেলব। পরেরবার তোদের মতনই ছুটব, দেখিস!

দিদি বললেন— এই তো চাই! কী কী করলে স্বাস্থ্য ভালো হয় তা তোমরা জানো। সেভাবে সব কিছু করো। পরেরবার আর কেউ হাঁপাবে না। আর তোমাদের সবার স্বাস্থ্য সম্পদ হয়ে উঠবে!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কী কী করলে স্বাস্থ্য ভালো হয়? তুমি কী কী করো, কী কী করো না? নীচে লেখো:

কী কী করলে স্বাস্থ্য ভালো হয়	এর মধ্যে কী কী তুমি করো	এর মধ্যে কী কী তুমি করো না

স্বাস্থ্যই সম্পদ

দিদিমণির কথাটা ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছোল জেমস। ওর কাকা তখন ব্যায়াম করছেন। তার ছাত্রছাত্রীরা দেখছে। এরপর ওরা নিজেরাও ব্যায়াম করবে। এবার জেমস বুঝল, কাকার স্বাস্থ্য তাঁর সম্পদ। সুন্দর

স্বাস্থ্যের জন্য কাকার কত সুবিধে। এত কাজ করেন। তাও হাঁপান না। এই সেদিন এক হাজার মিটার দৌড়ে মেডেল পেলেন!

স্কুলে গিয়ে জেমস তার কাকার কথা বলল।

দিদিমণি বললেন— সুস্থ শরীরই আমাদের সম্পদ হতে পারে। তার জন্য কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হয়।

জেমস বলল— কাকা বলেন, সময় মেনে ঠিকঠাক খাবার খাওয়া, জল খাওয়া আর ব্যায়াম করা দরকার।

টিকাই বলল— সাঁতার কাটাও খুব দরকার। তাতে ব্যায়াম হয়। ভালো ঘুমও হয়। শরীর আরো ভালো থাকে।

রিমঝিম বলল— আমি আজ সকালে তিন গ্লাস জল খেয়েছি। এবার থেকে রোজই ঠিকঠাক জল খাব।

— হ্যাঁ, ঠিকঠাক জল খাওয়া খুব দরকার।

মিঠাই বলল— আমি ডাঁটা-চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়েছি। শশা খেয়েছি।

— বাঃ! খুব ভালো। যা পাবে তাই খাবে। কী করতে হয় তা তোমরা বেশ জানো। শরীর ভালো থাকলে সব কাজই

আনন্দের। শরীর খারাপ হলে কাজের উদ্যমে ঘাটতি হয়। চিত্ত বলল--- আমার ঠাকুরদাও তাই বলতেন। — তোমরা চেষ্টা করো যাতে তোমাদের সবার স্বাস্থ্যই নিজের নিজের কাছে সম্পদ হয়ে ওঠে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমার চেনা মানুষদের কার স্বাস্থ্য ভালো আর কার স্বাস্থ্য খারাপ? নিজেরা বুঝে নীচে লেখো:

চেনা মানুষের নাম / সম্পর্ক	স্বাস্থ্য ভালো, নাকি খারাপ	কেন এমন ভাবছ

চাই জল, চাই বায়ু, মাটি ও আকাশ

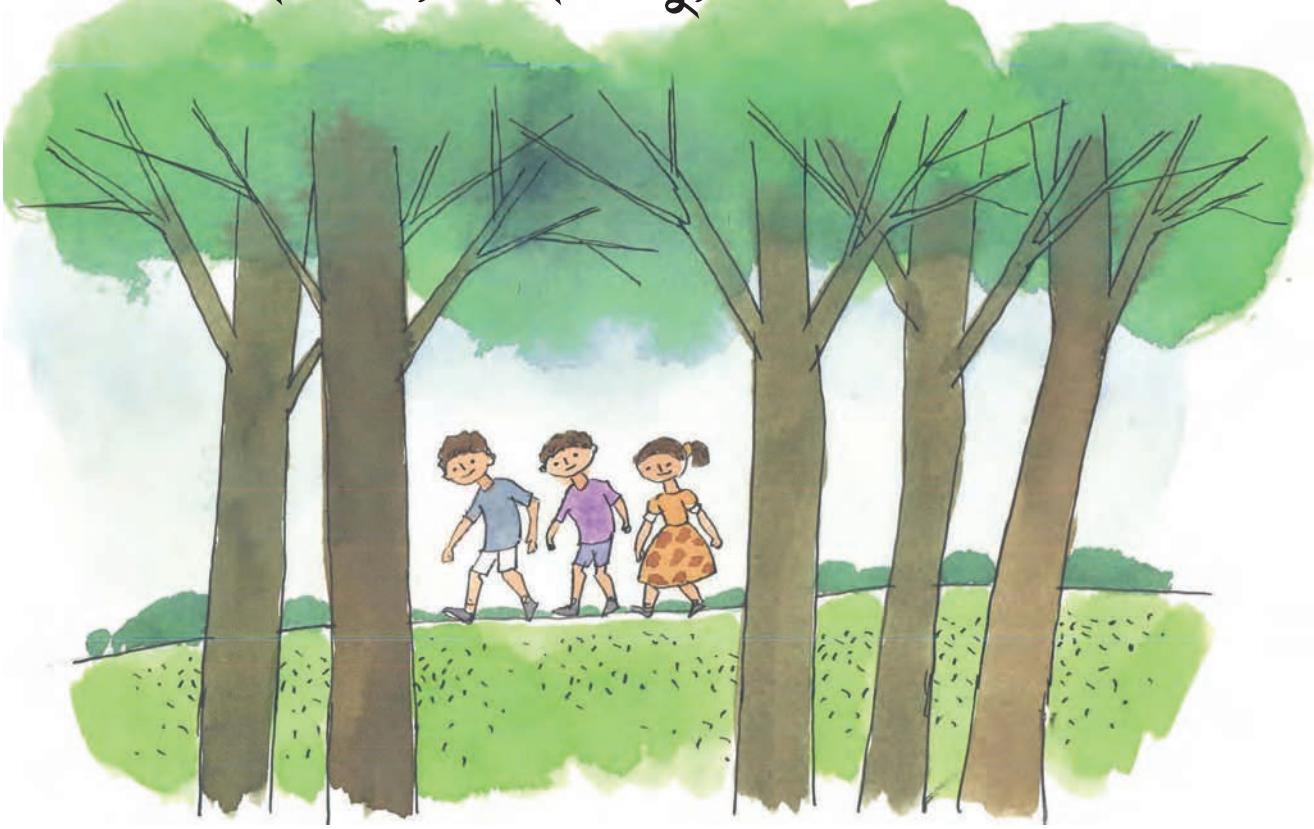

স্বাস্থ্য ছাড়া আর কী আমাদের সম্পদ? আর কী ভালো থাকলে আমাদের সুবিধে হয়? পুকুরের জল নোংরা হলে স্নান করতে ভালো লাগে না। জলে খারাপ গন্ধ থাকলে খাওয়ার সময়

বমি পায়। পরিষ্কার জল কি তাহলে আমাদের সম্পদ?

বাতাসে ধোঁয়া থাকলে চোখ জ্বলে। ধুলো থাকলে শ্বাসকষ্ট হয়। ঠান্ডা বাতাস শরীর জুড়িয়ে দেয়। তাহলে পরিষ্কার বায়ুও কি আমাদের সম্পদ?

মাটি নোংরা হলে চলাফেরার অসুবিধা হয়। পলিথিন পড়ে থাকলে তলার মাটি রোদ-হাওয়া-জল পায় না। উর্বর মাটিতে গাছপালা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। মাটিও কি আমাদের সম্পদ?

এইসব ভাবতে ভাবতে চিত্ত স্কুলে গেল। জল, মাটি, বায়ু নিয়ে নিজের ভাবনার কথা বলল। দিদিমণি চিত্তর খুব তারিফ করলেন। বললেন— জল, বায়ু, মাটি এসবই প্রকৃতির প্রধান সম্পদ। জন্মেই আমরা প্রকৃতি থেকে এসব পাই।

রিনা বলল— দিদি, বনের গাছও তো কেউ লাগায় না।

— ঠিক বলেছ। বনের গাছপালাও প্রকৃতির সম্পদ। সুযোগ পেলেই তোমরা গাছ লাগাবে। পারলে ফলের

গাছ। তাতে তোমাদেরও ফল খাওয়া হবে। আবার পশু-পাখিরাও সেই ফল খেতে পাবে।

রিম্পা বলল— তবে জল, বায়ু, মাটি আর সূর্যের আলো ছাড়া গাছ জন্মাতে পারে না।

— ঠিক। তাই ওগুলো প্রকৃতির প্রধান সম্পদ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

প্রকৃতিতে আরো সম্পদ আছে। সেগুলোর বিষয়ে নীচে লেখো:

প্রকৃতির সম্পদের নাম	কোথায় আছে	কী করলে তা নষ্ট হয়ে যাবে	কী করলে সেই সম্পদ টিকে থাকবে

জল ধরো, জল ভরো, জল বাঁচাতে চেষ্টা করো

টিউবওয়েল টিপে জল তুলছিল কৃষ্ণা। সে ভাবল, মাটির নীচের জল কখনও শেষ হবে না। মাঠে এত মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসেছে। তবু তো জল শেষ হয় না!

স্কুলে গিয়ে কৃষ্ণা সবাইকে একথা বলল। শুনে হারান বলল— একদম ভুল। আমার পিসিদের পাড়ায় মিনিতে জল উঠছে না।

দিদিমণি বললেন— ঠিকই। মাটির নীচের জল তোলা সহজ। কিন্তু নীচে জল পাঠানো সহজ নয়। নদী-সাগরের কাছাকাছি অঞ্চলে মাটির নীচে কিছুটা জল যেতে পারে। কিন্তু দূরের জায়গায় সে সুযোগ নেই।

কৃষ্ণা বলল— তাহলে কলের জল নষ্ট করা তো খুব খারাপ।

— বটেই তো। যথাসম্ভব বৃষ্টির জল দিয়ে চাষ করা দরকার। পুকুরগুলো গভীর করে কাটা দরকার। পাশে গাছ লাগানোও দরকার। শীতকালে সেই জল দিয়ে চাষ করা উচিত।

— দিদি, লোকেরা সজলধারার ট্যাপকল খুলে রাখে। ওই জল কোথা থেকে আসে?

পিন্টু বলল--- দেখিসনি? ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে জল তোলে। সেই জল পাইপ দিয়ে পাঠায়।

— সেও তো মাটির নীচের জল! এমন করে নষ্ট করে?

— তোমরা সবাইকে বোঝাবে। কেউ যেন জলের কল খুলে না রাখে। কোথাও জলের কল খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবে। দেখবে কেউ যেন জলের কল ভেঙে না দেয়।

— দিদি, আমার মাসির বাড়িতে জলের অভাব। মাসিরা ফুলগাছের গোড়ায় কাঁচা আনাজ ধোওয়া জল দেয়।

— এই রকমই করা দরকার। মাটির নীচের জল যত বাঁচে ততই ভালো। না হলে পরে খাবার জল পাওয়া মুশকিল হবে। তোমরা যখন বড়ো হবে তখন হয়তো দেখবে মাটির নীচে খাবার জল আর নেই!

আমিনা বলল— দিদি, বৃষ্টির সময় আমরা ছাদের জল ধরে স্নান করি।

— বাঃ! তোমরা অনেকেই জল বাঁচাও। এখন থেকে সবাই যত পারো জল বাঁচাতে চেষ্টা করো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা কে কীভাবে জল বাঁচাও? জল বাঁচাতে আর কী কী করা যায় তা নীচে লেখো :

মাটির নীচের জল দিয়ে কী কী করো	ওই জল বাঁচাতে কী কী করো	ওই জল বাঁচাতে আর কী কী করতে পারো

সবুজ সম্পদের ডাক

তৃপ্তিদের অনেক আম গাছ। আগে এসব গাছ লাগানো হতো না। নতুন গাছগুলো ঠাকুরদা লাগিয়েছেন। তৃপ্তি ভাবল, যে গাছগুলো এমনিতেই হয়েছে সেগুলো প্রকৃতির সম্পদ। যেগুলো আলাদা করে লাগানো সেগুলো মানুষের তৈরি সম্পদ। স্কুলে গিয়ে একথা বলল তৃপ্তি। ওর কথা শুনে করিম বলল--- আমাদেরও ওইরকম গাছ আছে। বাগানে বকুলগাছ আছে। কেউ লাগায়নি। কয়েকটা নারকেলগাছ অনেক পুরোনো। কেউ লাগায়নি। গোলাপজাম গাছগুলো, কাঁঠালিচাঁপা গাছটা কেউ লাগায়নি। আবার কিছু নারকেলগাছ, আমগাছ দাদা লাগিয়েছে।

দিদিমণি সব শুনলেন। তারপর বললেন--- এখন ফল-ফুলের ব্যাপারটা এই রকমই। কিছু মানুষের তৈরি করা সম্পদ। কিছু আবার প্রকৃতিই তৈরি করে রেখেছে।

যেমন স্কুলের মাঠের ছাতিম, শিরীষ, শিমুল, বেল— এই গাছগুলো লাগানো হয়েছে। কিন্তু পুকুরপাড়ের বাঁশগুলো কেউ লাগায়নি।

— দিদি, এখন বলছেন কেন? আগে অন্যরকম ছিল?

— হ্যাঁ। আগে তো সব ফল-ফুলই প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। বনের গাছের মতো। মানুষ তখন বনের ফলমূল খেয়েই থাকত।

একথা ওরা সবাই জানে। হামিদ বলল— এখন অনেক ফুল-ফল একেবারে ধান-পাটের মতো চাষ হয়। গোটা একটা পেয়ারা বাগান। ছোটো ছোটো গাছ। কোথাও আবার খেত ভরতি গাঁদা ফুল! পরেশকাকু ঘৃতকুমারী, বাসক, কালমেঘ গাছ লাগান। বলেন, এর থেকে ওষুধ পাওয়া যায়।

বীণা বলল— আমার মামার বাড়ির কাছে বড়ো বড়ো আম বাগান। দাদু বলে সব গাছই দুই-তিনশো বছর

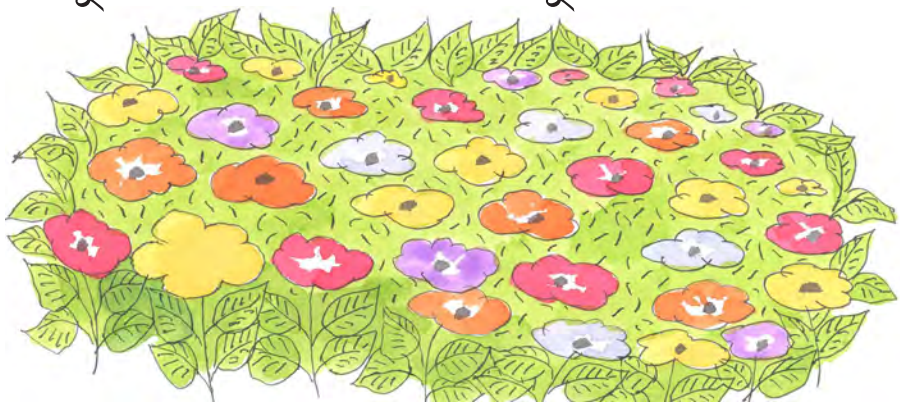

আগের। কেউ ওসব গাছ লাগায়নি।

— তাহলে ওগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ। চাষ করে যা হয় সেগুলো কৃষি-সম্পদ। বাগানের ফল বাগিচা-সম্পদ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

সম্পদের মধ্যে কোনগুলো প্রাকৃতিক? কোনগুলো মানুষের তৈরি? সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়? নীচে লেখো:

ফুল-ফল-ফসলের নাম	কোথায় পাওয়া যায়	এটা কী ধরনের সম্পদ

একটি গাছ অনেক প্রাণ

গাছ লাগানোর উৎসবে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে। খুব মজা।

বিপাশা বলল — কিন্তু উৎসব করে গাছ লাগানো হয় কেন?

দিদিমণি বললেন — গাছ যে জীবেদের নানা উপকার করে।

সাথী বলল — ঠিকই তো। গাছ থেকে আমরা ফুল পাই, ফল পাই, শাকসবজি পাই।

রাবেয়া বলল — গাছ থেকে আমরা যে শুধু খাবারই পাই, তাই নয়। আমাদের বাড়ির পাশের আমগাছে অনেকগুলো পাখির বাসা আছে।

সুখেন বলল — একটা গাছে আমি পিঁপড়ের বাসাও দেখেছি।

রবি বলল — গরমকালে দুপুরে গাছের তলায় ছায়াতে বসলে খুব আরাম লাগে।

রূপা বলল — আমাদের বাড়ির খাট, আলমারি, দরজা, জানলা সবই কাঠের তৈরি।

মজিদ বলল — নৌকো তো গাছের কাঠ দিয়েই তৈরি হয়।

— কাগজ তৈরি করতেও অনেক বাঁশ লাগে। অন্যান্য গাছের বিভিন্ন অংশও লাগে।

রূপা বলল — দিদি, তাহলে তো কাগজ বানাতে অনেক গাছ কাটার দরকার হয়?

— হ্যাঁ। তাইতো শুধু শুধু কাগজ নষ্ট করা উচিত নয়। তাহলে বেশি বেশি গাছ কাটতে হবে।

প্রশান্ত বলল — তাহলে তো আমাদের বইগুলোকেও যত্ন করে রেখে দেওয়া দরকার।

— কাগজ ব্যবহারের পর নোংরা হয়ে যায়। কখনও কখনও পচে যায়। তাই দিয়েও আবার কাগজ বানানো যায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বিভিন্ন জীব গাছের থেকে কী কী পায়? মানুষ কীভাবে কাগজের ব্যবহার করে? সেসব নীচে লেখো।

জীবের নাম	গাছ থেকে কী কী পেতে পারে
পাখি	
বাঁদর	
পিঁপড়ে ও মৌমাছি	

কী কী ভাবে কাগজ নষ্ট হয়?	
কী কী ভাবে কাগজ বাঁচানো সম্ভব?	
তোমরা কীভাবে কাগজ ব্যবহার করো ও কাগজ বাঁচাও?	

হাতে গড়া শিল্প-সম্পদ

মানুষের তৈরি আরো কত কী আমাদের কাজে লাগে। মাটির ভাঁড়, কলসি, লোহার কোদাল, আরও কত কী। এগুলোও সব মানুষের তৈরি সম্পদ। এগুলো তো কৃষি-সম্পদ নয়! স্কুলে সঞ্জীব একথা বলল।

শুনে তড়িৎ বলল— পিতলের বাসনও তো মানুষের তৈরি।

দিদিমণি বললেন— এগুলো সবই শিল্প সম্পদ। ছোটো ছোটো ঘরোয়া শিল্প। তোমাদের কাছাকাছি জায়গায় এসব শিল্প রয়েছে।

ঝুম্পা বলল--- বাঁশের ঝুড়ি, ঘাসের মাদুরও কি শিল্প-সম্পদ?

রাবেয়া বলল— বাঁশ তো বাগানে হয়। ঘাস হয় মাঠে। এগুলো প্রাকৃতিক-সম্পদ বা কৃষি-সম্পদও হতে পারে।

— বাঁশ চাষ করলে তা কৃষি-সম্পদ। সেটা ঝুড়ি তৈরির কাঁচামাল। কিন্তু ঝুড়ি তৈরি করা হাতের কাজ। মাদুর বোনাও তাই। ঘাস মাদুরের কাঁচামাল।

— হাতের কাজ কি শিল্প?

--- এগুলো ঘরোয়া শিল্প। ভালো কথায় বলে কুটির শিল্প। এই ধরনের কাজ দিয়েই শিল্পের শুরু।

রতন বলল— কাঠের চেয়ার-টেবিল তৈরি করা?

— সেটাও হাতের কাজ।

— আচ্ছা দিদি, বাড়ি তৈরি করাও কি শিল্প?

— হ্যাঁ। বাড়ি তৈরি করাকে বলে নির্মাণ-শিল্প।

মাম্পি বলল— বড়ি? বড়ি তৈরি করা কি শিল্প?

— হ্যাঁ। হাতের কাজ বা ঘরোয়া শিল্প। এই রকম অনেক ধরনের ছোটো শিল্প তোমরা দেখেছ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা নানান ঘরোয়া শিল্প, ছোটো শিল্প বা হাতের কাজ বিষয়ে জানো বা দেখেছ। সেসব নীচে লেখো:

সম্পদের নাম	কী কী দিয়ে তা তৈরি হয়	সেটা কী ধরনের সম্পদ

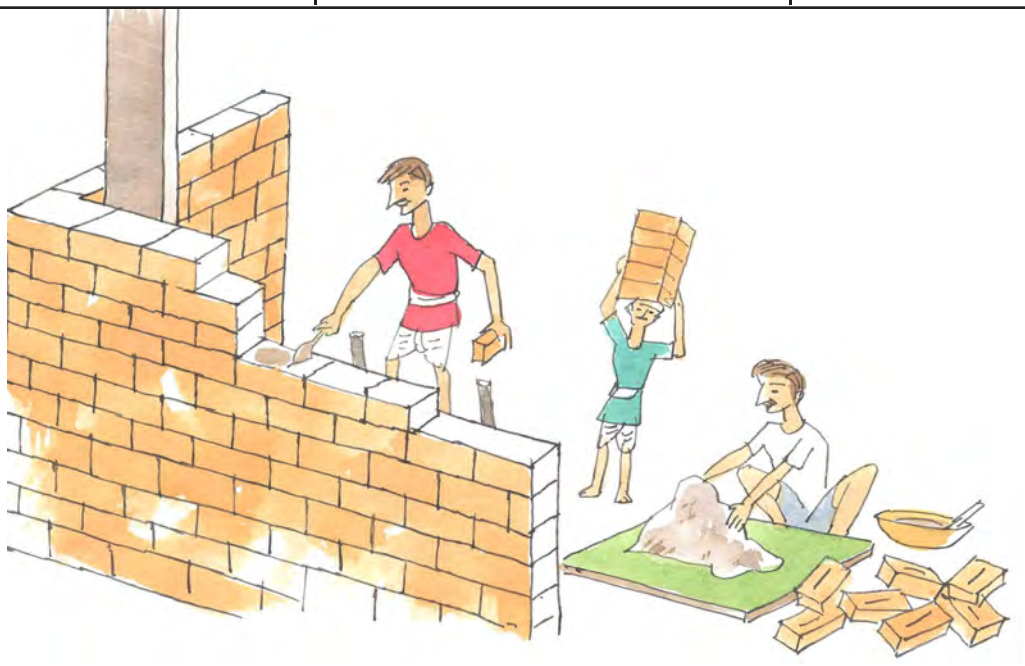

হরেকরকম শিল্পকথা

ইটখোলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল স্বপন। পঁচিশ-তিরিশজন লোক ইট তৈরি করছেন। দশ-পনেরোজন রোদে ইট মেলছেন। আট-দশজন রোদ থেকে তুলছেন। আর পনেরো-কুড়িজন ভাটার ভিতর থেকে পোড়া ইট বের করে সাজাচ্ছেন। স্বপন ভাবল, ইটখোলা কি ঘরোয়া শিল্প?

একটা চালকলের পাশে ইলিয়াসদের বাড়ি। সেখানে অনেক কাজ হয়। বয়লারে ধান ঢালা, সিদ্ধ ধান শুকোতে দেওয়া, ধান নাড়া। কত কাজ! সব মিলে ষাট-সত্তরজন কাজ করেন। ইলিয়াস মাঝে মাঝে দেখে আর ভাবে, চালকলটা কি ঘরোয়া শিল্প?

স্কুলে ওরা সব বলল। দিদিমণি বললেন— বাঃ। বেশ দেখেছ তো। এগুলো একটু বড়ো মাপের শিল্প। সবাই কাছাকাছি এরকম শিল্প দেখে আসবে। তারপর কী দেখলে তা অন্যদের বলবে।

দিদি একটু বড়ো মাপের বলতে কী বোঝাতে চাইলেন সেটাই স্বপন ভাবল। তারপর বলল— দিদি, আরো বড়ো মাপের শিল্প আছে?

— আছে তো। মানুষ কত জিনিস তৈরি করেছে। সেগুলো তৈরি করতে বড়ো বড়ো মেশিন লাগে। একটু ভাবো। কোন কোন জিনিস তোমরা ব্যবহার করো। কিন্তু তৈরি করা দেখোনি।

অর্ণব বলল— সিমেন্ট, বিদ্যুৎ!

— ঠিক। এছাড়া বড়ো বড়ো মেশিন, গাড়ি তৈরি করেছে মানুষ।

— মশলা মাখার মিক্সার, রাস্তা তৈরির রোলার, ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার!

— ঠিক। এইসব মেশিন তৈরির শিল্পগুলোই বড়ো শিল্প।

ঘরোয়া শিল্পের নানান কথা

রাবেয়াদের ঘরে একটা ছোটো ঝুড়ি আছে। বাঁশের সরু সরু বাখারি দিয়ে তৈরি। ফুল কাটা, ঢাকা লাগানো, সুন্দর। কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু মা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করেন। আবার তুলে রাখেন।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওদের হাতের কাজ নিয়ে প্রদর্শনী করবে। আজ তাই নিয়ে ক্লাসে কথা উঠল।

রাবেয়া স্কুলে ওই ঝুড়িটার কথা বলল। তারপর বলল— দিদি, ওই ঝুড়িটা তো কাজে লাগে না। ওটা কি শিল্প-সম্পদ?

দিদিমণি বললেন— কেন? ওটা দেখার কাজে লাগে! ওটা দেখে ভালো লাগে!

রবি বলল— ওরকম তো কত জিনিস আছে। দেখতে ভালো, শো কেসে সাজিয়ে রাখতে হয়।

তুহিন বলল— আমাদের ঘরে ঝিনুক দিয়ে তৈরি একটা পুতুল আছে।

রাবেয়া বলল— এগুলোও হাতের কাজ, ঘরোয়া শিল্প?

— শুধু হাতের কাজ নয়। এগুলো হাতের সূক্ষ্ম কাজ। একটু অন্য অর্থে শিল্প।

রবি বলল— বুঝেছি। ছবি আঁকার মতো। শিল্পীরা ছবি আঁকেন।

মিন্টু বলল— নাটকে যারা অভিনয় করেন, তাঁরাও শিল্পী।

তুহিন বলল— মিন্টুর ইচ্ছা ও নাটকে অভিনয় করবে!

— সে তো ভালোই। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা অভ্যাস করো। শরীরের ভঙ্গিতে কীভাবে মনের ভাব বোঝাতে হয় তা শেখো। একসময় দেখবে অভিনয় করার সুযোগ পাবে।

তিয়াসা বলল— রমেশকাকু পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরি করেন। সেও তো সূক্ষ্ম কাজের শিল্প।

— বেশ বলেছ তো! এসব হলো সুন্দর কিছু করার শিল্প। সৌন্দর্য সৃষ্টির শিল্প। মনে আনন্দ দেওয়ার শিল্প। এমন শিল্প-সম্পদ তোমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

দলে করি বলাবলি তারপরে লিখে ফেলি

১। নানা ধরনের শিল্প-সম্পদের কথা তোমরা জানো। এবার নীচে সেসব লেখো:

শিল্প-সম্পদের নাম	তৈরি করা দেখেছ কিনা	চেনা অন্য কেউ দেখেছেন কিনা	কী ধরনের শিল্প-সম্পদ

২। তোমাদের চারপাশের শিল্প-সম্পদগুলো খেয়াল করো। এবার তা সারণীতে লেখো:

সুন্দর শিল্প-সম্পদের নাম	কী দিয়ে তৈরি	কোথায় দেখেছ	কে বা কারা তৈরি করেছেন

সজাগ থেকো, ভুলে যেও না (১)

কুমকুম খুব ভালো মেয়ে। সব নিয়ম মেনে পথে চলে। গাড়িগুলোকে মুখোমুখি রেখে ডান দিক দিয়ে হাঁটে। যাতে সামনের দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে খেয়াল করতে পারে। ফুটপাত থাকলে তার উপর দিয়েই হাঁটে।

রাস্তা পেরোতে হবে? আগে দু-দিক দেখে নেয়। কোনো দিক থেকে গাড়ি আসছে কিনা। শহরের রাস্তা পেরোয়

জেব্রা ক্রসিং দিয়ে। রাস্তা পারাপারের মানুষের ছবি দেওয়া সিগন্যাল সবুজ দেখালে তবেই পেরোয়। রাস্তা পেরোনো সময় বড়োদের হাত শক্ত করে ধরে রাখে। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামে না। কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার করলে বারণ করে। মোটর বাইকে চাপলে হেলমেট পরে নেয়।

জেব্রা ক্রসিং কী জানো তো? রাস্তায় জেব্রার গায়ের মতো দাগ থাকে। সেটাই জেব্রা ক্রসিং। গতকাল কুমকুম কলকাতায় গিয়েছিল। সিগন্যালে মানুষের ছবি সবুজ হওয়ার পরেই রাস্তা পেরিয়েছে।

পথে যেতে যেতে ঝড় এলে কুমকুম গাছতলায় দাঁড়ায় না। ঝড়ের সময় কার মাথায় নাকি গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল। সেটা শুনেই ও খুব সাবধান হয়ে গেছে। ঝড় এলেই ছুটে যায় কাছাকাছি কোনো বাড়ির বারান্দায়।

একদিন ফাঁকা মাঠ দিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে কুমকুম আর রিম্পা। হঠাৎ শুরু হলো বাজ পড়া। কুমকুম শুনেছে উঁচু গাছে বাজ পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকলে বাজ যদি ওদের উঁচু গাছ ভাবে! তাই ও রিম্পাকে মাটিতে হাত-পা জড়ো

করে ও মাথা নিচু করে বসে পড়তে বলল। নিজেও একইভাবে বসে পড়ল।

খানিক পরে বাজ পড়া কমল। তবে বৃষ্টি কমল না। বন্ধুর বাড়ি পৌঁছতে সপসপে ভিজে গেল দু-জনে। বন্ধুর জামা ওদের একটু ঢিলে হলো। তবু ওরা তার থেকে জামা নিয়ে পরল। শুকোনোর আগে আর নিজেদের ভিজে জামা পরল না। কুমকুম বলল— ভিজে জামা পরলে পরপর অনেক কষ্ট। হাঁচি, গলা খুশখুশ, নাকে জল। সাতদিনের ধাক্কা। কুমকুম এত জানে। তবু সবার কাছে জানতে চায়। চলাফেরায় আরো কীভাবে সাবধান হবে?

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

সাবধানে চলাফেরা করার জন্য কুমকুমের আর কী কী করা উচিত? নীচে তোমাদের পরামর্শগুলো লেখো:

সমস্যা	কী করলে ভালো হয় বলে ভাবছ
পায়ে চামড়ার জুতো, রাস্তায় জল জমেছে	
রাস্তা পেরোতে গিয়ে সিগন্যালের আলো হঠাৎ লাল হয়ে গেছে	
হেলমেট ছাড়া মোটর বাইক চালাচ্ছে	
চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামছে	
গাড়ি খেয়াল না করে রাস্তা পারাপার করছে	

সজাগ থেকো, ভুলে যেও না (২)

দরকার মতো কুমকুম মায়ের হাতে হাতে একটু আনাজ কাটে। আগে ধোয়, তারপর খোসা ছাড়ায়। কেটে নেয়। শেষে বঁটির ধারালো দিকটা দেয়ালের দিকে করে রাখে। পরে আবার সেখান থেকে নেয়।

কুমকুমের নেলকাটার নেই। ব্লেড দিয়েই নখ কাটে। কিন্তু খুব সাবধানে কাটে। আগে নখগুলো ভালো করে ভিজিয়ে নরম করে নেয়। তারপর অল্প চাপ দিয়েই নখ কাটে। ওর মামা একবার শুকনো নখ কাটার চেষ্টা করে বিপদ বাধিয়েছিলেন। শক্ত নখ। খুব জোর করে কাটছিলেন।

কাঁচা নখ আর চামড়ার খানিকটা কেটে গিয়েছিল। রক্ত বেরোয়। ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। একথা শুনেই কুমকুম সাবধান হয়ে গেছে।

টুকুনের একটা ছোট্ট কোদাল আছে। সেটা দিয়ে ও বাগানে মাটি কোপায়। ফুল, লঙ্কা, বেগুনের চারা লাগাতে হবে যে! কাকা ওকে মাটি কোপানোর কৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনভাবে দাঁড়ায় যে পায়ে কোদাল লাগবে না।

দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় টুকুন খুব সাবধানি। সে একবার দেখেছিল, একটা টিকটিকির লেজ দরজার পাল্লার চাপে কেটে গেল। তারপর থেকে সে দরজা বন্ধ করার সময় আগে খেয়াল করে অন্য হাতটা দরজায় চাপ খেতে পারে কিনা!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা কোন কাজে কীভাবে সাবধান হও ? নীচে লেখো :

ঘরোয়া কাজের নাম/বিবরণ ইত্যাদি	কীভাবে সাবধান হবে

সজাগ থেকো, ভুলে যেও না (৩)

ইলেকট্রিকের সুইচে হাত দেওয়ার আগে কুমকুম সবসময় হাত মুছে নেয়। হাতে যেন জল না থাকে। জল থাকলে শক লাগতে পারে। ইস্ত্রি করার সময়েও খুব সাবধান থাকে। সুইচ অফ না করে ইস্ত্রিতে হাত ছোঁয়ায় না। যদি ইস্ত্রিটা খারাপ থাকে তাহলে শক লাগতে পারে।

একবার একটা প্লাগ কাজ করছিল না। কুমকুমের দাদা প্লাগের ফুটোয় তার ঢুকিয়ে দেখছিলেন, কী হয়েছে। আর জোর একটা শক খেয়েছিলেন। সেই থেকে কুমকুম সাবধান হয়েছে। প্লাগ কাজ না করলে টেস্টার দিয়ে দেখে। কখনও অন্য কিছু ঢোকায় না।

কুমকুম মোমবাতি জ্বালাতে পারে। এক হাতে দেশলাই বাক্স আর এক হাতে দেশলাই কাঠি নেয়। তারপর কাঠিটা জ্বালায়। এবার মোমবাতির পলতের কাছে দেশলাইয়ের শিখাটা ধরে। একবার কুমকুমের ছোটোমাসি মোমবাতির তলায় দেশলাই কাঠি ধরেছিলেন। মোম গলে গলে পড়েছিল। বাতি জ্বলেনি। তা দেখে কুমকুম শিখে নিয়েছে।

শীতকালে কুমকুম নিজের স্নানের জল নিজেই গরম করে নেয়। আগে উনুনে এক ডেকচি জল বসায়। তারপর গ্যাসের উনুন জ্বালায়। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তবেই উনুনের নব ঘোরায়। জল গরম হয়ে গেলে গরম ডেকচি হাত দিয়ে ধরে না। একটা কাপড় দিয়ে ধরে। সেই জল বালতির ঠান্ডা জলে মিশিয়ে নেয়।

বাড়ির বাইরে গেলে কুমকুম সবসময়ে পায়ে চটি বা জুতো পরে। রাস্তায় যদি পায়ে কিছু ফুটে যায়! একবার ওর দাদা খালি পায়ে বাইরে গেছিলেন। পায়ে জং ধরা পেরেক ফুটেছিল। সেই থেকে কুমকুম খুব সাবধান হয়ে গেছে। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে আগেই ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নেয়। নিজের জামাকাপড়েরও খুব যত্ন নেয় কুমকুম।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

ইলেকট্রিক আর আগুন নিয়ে কাজে তোমরা কীভাবে সাবধান হও? নীচে লেখো :

কাজের নাম / বিবরণ	কীভাবে সাবধান হও

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

সাঁতারু হিসেবে স্কুলে টিকাই-এর খুব নামডাক। কিন্তু ওর বন্ধুরা সবাই তেমন ভালো সাঁতরাতে পারে না। রাজু একবার জলে ডুবে যাচ্ছিল। ওকে বাঁচাতে টিকাই পুকুরে ঝাঁপ দিল। পলাশও ভালো সাঁতার জানে। সেও ঝাঁপ দিল জলে। রাজুর কাছাকাছি পৌঁছে টিকাই বলল— সাবধান। তুই আমায় জড়িয়ে ধরিস না। তাহলে দুজনকেই ডুবতে হবে!

তারপর টিকাই রাজুর হাতের কাছে একটা গামছা ছুঁড়ে দিল। রাজু সেটা জাপটে ধরল। গামছার অন্য দিক ধরল টিকাই। সাঁতার কেটে চলল। রাজুর পিছনে রইল পলাশ। ওকে ঠেলতে থাকল। এভাবে ওরা পাড়ের কাছে এল। তারপর ওকে জল থেকে তুলল। রাজু তখন কথা বলতে পারছে না।

এভাবে বেশিক্ষণ রাখা যায় না। তাই এরপর রাজুকে উপুড় করে শুইয়ে দিল টিকাই। দু-হাত দু-দিকে ছড়ানো। মাথাটা কাত করা। এবার ওর পিঠের দু-দিকে চাপ দিতে লাগল। বেশ কিছুটা জল বেরিয়ে গেল। এমনভাবে চলল মিনিটখানেক। তবুও রাজুর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এবারে রাজুকে চিত করে শোয়ানো হলো। ওর নাকের কাছে টিকাই কান রাখল। কিন্তু কোনো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল না। তখন রাজুর চিবুকটাকে প্রথমে একটু উঁচু করে দিল ওরা। আর রাজুর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দেওয়া হলো। তারপর টিকাই রাজুর হাঁ করা মুখের ভিতর দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিল। তাতে একটু কাদা, আর দু-একটা ঝাঁঝি গাছের

পাতা বেরিয়ে এল। বুকভরে বাতাস টেনে নিয়ে রাজুর খোলা মুখের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরল টিকাই। তারপর সেই বাতাসটা ফুঁ দিয়ে পুরোটাই ঢুকিয়ে দিল রাজুর ফুসফুসে। পলাশ এক হাতের দু-আঙুল দিয়ে রাজুর নাকটা চেপে ধরে রেখেছিল। যাতে টিকাই-এর মুখের হাওয়াটা রাজুর নাক দিয়ে বেরিয়ে না যায়। এরকম দুই-তিন বার করবার পরও রাজুর কোনো সাড়া নেই। এর ভেতরে জেমসের কাকা ওদের দেখে দৌড়ে এসেছেন। কাকু বললেন— টিকাই, মনে হয় রাজুর হৃদযন্ত্র কাজ করছে না। দেখিতো, নাড়ির ছন্দ আছে কিনা ! রাজুর গলার মাঝখানে উঁচু জায়গাটার পাশে একটা আঙুল দিলেন কাকু। মন দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। কাকুর কপাল কুঁচকে গেল। বললেন— না তো, রাজুর কোনো পালস নেই ! টিকাই তাড়াতাড়ি করো। এবার মনে হচ্ছে রাজুর হৃৎপিন্ডে বাইরে থেকে চাপ দিতে হবে। সেভাবেই হৃৎপিন্ডের কাজ চালু করতে হবে।

টিকাই বলল— কাকু, আমি কি ওই শ্বাসপ্রশ্বাস চালাবার কাজটা করে যাব?

কাকু বললেন— হ্যাঁ। তুমি নিশ্বাসের কাজটা দেখো। আমি হৃৎযন্ত্রে চাপ দিই। এই বলে কাকু রাজুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। পলাশকে বললেন— দেখো, রাজুর বুকের পাঁজরের সব থেকে নীচের হাড়দুটো মিশেছে এইখানে।

৪ ও ৫ নম্বর ছবির কাজগুলি পর্যায়ক্রমে করে যেতে হবে।

সেই জায়গা থেকে ঠিক দু-আঙুল ওপরে বুকের মাঝখানে ওই হাড়টার ওপর হাতদুটো দিয়ে চাপ দিতে লাগলেন কাকু। এমনভাবে চাপ দিলেন যাতে দু-ইঞ্চির মতো নামানো যায়। 'এক-দুই-তিন-চার' বলতে বলতে টানা একই ছন্দে চাপ দিতে লাগলেন। পলাশকে বললেন— প্রতি মিনিটে প্রায় ষাটবার এভাবে চাপ দিতে হয়। তাই এক-দুই-তিন করে গুনলে সুবিধা হয়। এরকমভাবে পনেরোবার হৃৎযন্ত্রকে চাপ দিতে থাকলেন কাকু। আর তার পরেপরেই দু-বার করে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর চেষ্টা করতে থাকল টিকাই। কাকু আর টিকাই এই কাজ বারবার করতে থাকল। রিনা ততক্ষণে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আর তখনই রাজু চোখ খুলে তাকাল। নিজে থেকেই নিশ্বাস নিচ্ছে মনে হলো।

কাকু দেখলেন, রাজুর গলার পাশে নাড়ির ছন্দ ফিরে এসেছে। রাজু যেন ঘুম থেকে উঠল। চারপাশে এতজনকে দেখে বলল— কী হয়েছিল আমার?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন— ভাগ্যিস তোমার বন্ধু টিকাই, পলাশ, রিনা আর কাকু ছিলেন। ওদের ধন্যবাদ দাও। না

হলে কী যে হতো ভাবতেই পারছি না। এবার থেকে সাঁতার না জানলে জল থেকে সাবধান থেকো।

পরদিন ডাক্তারবাবু টিকাইদের স্কুলে গেলেন। কেউ জলে ডুবে গেলে কী কী করতে হয় তা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। পাশের পাতায় ছবিগুলো দেওয়া হলো। সবাই ভালো করে দেখে নাও।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কেউ জলে ডুবে গেলে তাকে তুলতে হবে। তখন কীভাবে সাবধান হবে? পরে কী কী করবে? এসব নিয়ে তোমার ভাবনা নীচে লেখো :

কাজ	সাবধানতা
জল থেকে তোলার সময়	
পেটের জল বের করার সময়	
শ্বাস চালু করার সময়	
হৃৎপিন্ড চালু করার জন্য	

নীচের ছবিগুলো আঁকা রইল। তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও :

র
ং
বা
হা
র

নীচের ছবিগুলো আঁকা রইল। তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও :

র
ং
বা
হা
র

নীচের ছবি আঁকা রইল। তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও :

রং বাহার

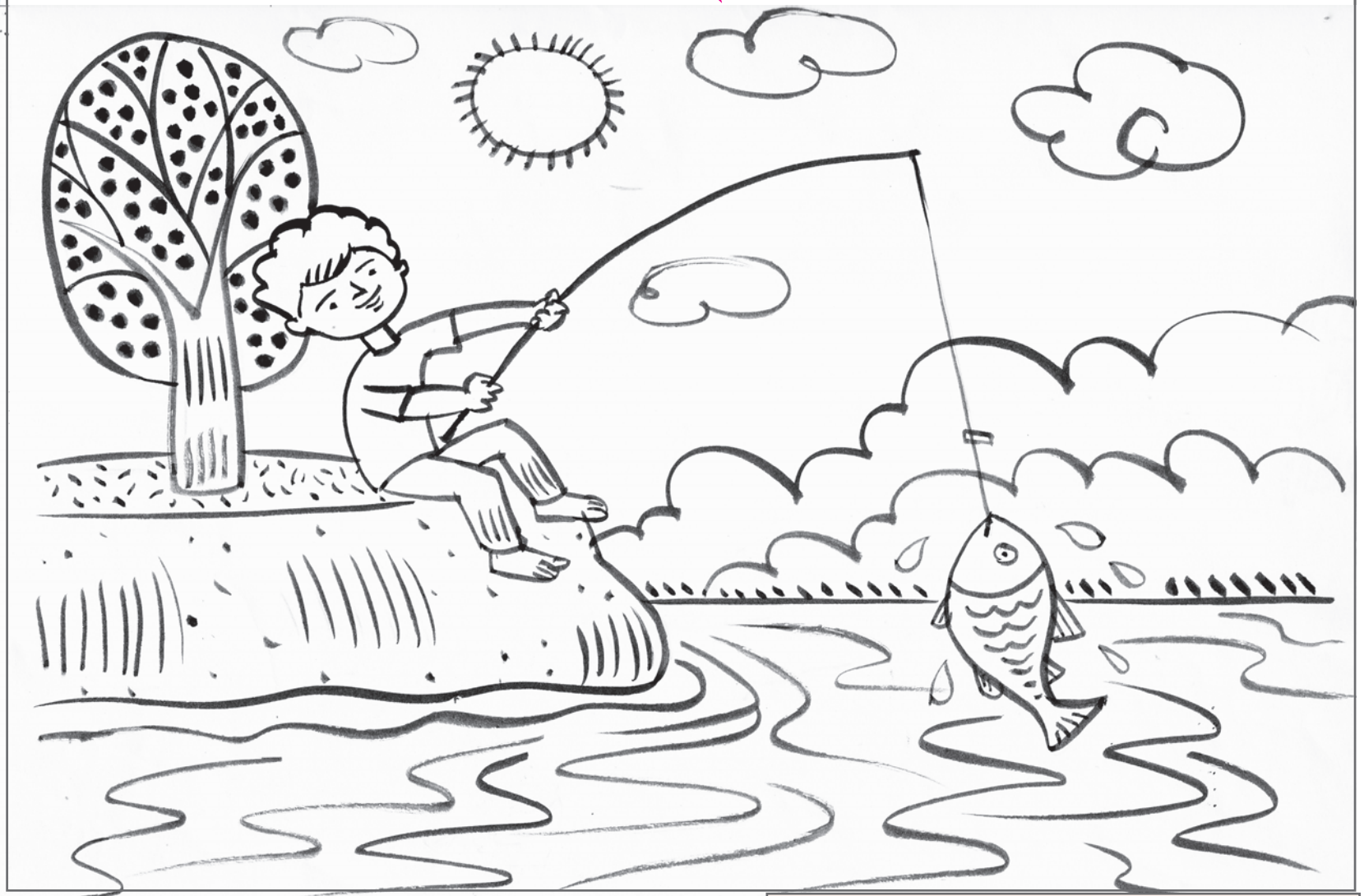

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমাদের পরিবেশ (তৃতীয় শ্রেণি)

পাঠ্যসূচি

১. শরীর

ক) মানুষের দেহ : প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ

খ) দেহের যত্ন ও সুঅভ্যাস গঠন

গ) হাঁটা, সাঁতার কাটায় ও খেলায় ব্যবহৃত অঙ্গের নাম

ঘ) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় তাদের কাজ

ঙ) চেনা পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর শরীর

চ) মানুষের দেহের সঙ্গে অন্য প্রাণীদেহের মিল

২. খাদ্য

ক) মানুষের খাবার : আমাদের পরিচিত খাবারের নাম

খ) বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম ও প্রাসঙ্গিক ধারণা

গ) বিভিন্ন প্রকার প্রাণীজ খাদ্যের নাম ও প্রাসঙ্গিক ধারণা

ঘ) প্যাকেট করা তৈরি খাদ্য

ঙ) রন্ধন

চ) খাদ্য বিনিময়

ছ) পশুপালন ও রন্ধন

৩. পোশাক

ক) মানুষের পোশাক : পরিধেয় বিভিন্ন পোশাক ও তার রং

খ) শীতকাল ও বছরের অন্যান্য সময়ের পোশাক

গ) বর্তমান পোশাকের উপাদান ও উৎস

ঘ) প্রাচীন মানুষের পোশাক

৪. বাসস্থান

ক) মানুষের বাসস্থান : বিভিন্ন আকৃতির বাড়ি

খ) বাড়ির ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপাদান

গ) বাড়ির গঠনগত বিভিন্ন অংশ ও তার গুরুত্ব

ঘ) বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান

ঙ) আধুনিক মানুষের বাড়ি

চ) বাড়ির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপাদান

ছ) দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের বাড়ি

জ) প্রাচীন মানুষের বাড়ি

৫. পরিবার

ক) পরিবার : পরিবারের সদস্য, তাদের নাম ও পারস্পরিক সম্পর্ক

খ) মানুষের পরিবার : নিকট আত্মীয়দের নাম ও তাদের বাসস্থান

গ) প্রাণীর পরিবার

ঘ) বর্তমান মানুষের বাসস্থান

ঙ) পরিবারের সদস্যদের জীবিকা পরিবর্তন

৬. আকাশ

ক) দিন ও রাতের আকাশ

খ) সূর্যের অবস্থান ও দিক নির্ণয়

গ) সূর্য ও পৃথিবী

ঘ) সূর্যের অবস্থান ও সময়ের পরিবর্তন

ঙ) অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

চ) তারা বা নক্ষত্র

ছ) মেঘ

জ) আকাশে রঙের ছটা

৭. স্বাস্থ্য

ক) সম্পদ ও স্বাস্থ্য

খ) সম্পদ ও জল, বায়ু, মাটি

গ) সম্পদ ও হাতের কাজ

৮. সাবধানতা

ক) সাধারণ নিরাপত্তাবিধি : পথচলা

খ) প্রতিদিনের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তাবিধি

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: শরীর, খাদ্য (পৃ.১—৫০)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: পোশাক, ঘরবাড়ি, পরিবার (পৃ.৫১—১১১)

৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: আকাশ, সম্পদ, সাবধানতা (পৃ.১১২—১৫৪)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
১) সারণি পূরণ ২) ছবি বিশ্লেষণ ৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ৪) দলগত কাজ ও আলোচনা ৫) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ ৭) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন ৮) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি ৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	১) অংশগ্রহণ ২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান ৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য ৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা ৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার একটি নকশা দেওয়া হলো)

(১) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

দুধ থেকে নীচের কোন খাবারটি তৈরি হয়?

(ক) রুটি (খ) চানাচুর (গ) ছানা (ঘ) মুড়ি

(২) ঠিক বাক্যের পাশে টিক (✓) দাও ও ভুল বাক্যের পাশে ক্রস (✗) দাও।

(ক) ডাক্তারবাবুদের পোশাক হলো অ্যাপ্রন।

(খ) মুখের লালা খাবার হজম করতে কাজে লাগে না।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) পুকুরের জল বাষ্প হয়ে ———— তৈরি করে।

(৪) **বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :**

ক) চানাচুর, নিমকি, ভাত, চিপস

খ) ধুতি, সালোয়ার, পাঞ্জাবি, বর্ষাতি

গ) আলু, আম, লঙ্কা, আনারস

ঘ) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়

(৫) ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ দাগ দিয়ে মেলাও :

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
ক) মায়ের বোন	ক) মেঠো ইঁদুরের বাসা
খ) মাটির নীচে গর্ত	খ) শুক্লপক্ষের প্রথমা
গ) অমাবস্যার পরের দিন	গ) নাড়ির ছন্দ
ঘ) ঝিনুক দিয়ে পুতুল তৈরি	ঘ) ঘরোয়া শিল্প
ঙ) হৃদযন্ত্র	ঙ) মাসিমা / খালা

(৬) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন (একটি থেকে দুটি বাক্যে উত্তর দিতে হবে)** : ক) যাযাবর মানুষ কোথায় থাকত? খ) পালং, কচু, পান আর ধানের কোন কোন অংশ আমরা খাই? গ) শীতকালে পশু-পাখিরা ঠান্ডা থেকে কীভাবে রক্ষা পায়? ঘ) আগুনের ব্যবহার জানার পর মানুষের কী কী সুবিধা হলো?

(৭) তোমাকে দিদিমণি একটি কালমেঘ আর একটি বাসক গাছের পাতা দিলেন। তুমি এদের কীভাবে কাজে লাগাতে পারো?

(৮) প্রায়ই তোমার বন্ধুর পায়ের চামড়া ফেটে যায়। তুমি বন্ধুকে কীভাবে পায়ের যত্ন নিতে বলবে?

(৯) **চিহ্ন ব্যবহার করে** তোমার বাড়ির দরজা, জানলা, শোবার ঘর, বারান্দা, আর রাস্তা দেখাও।

(১০) **পার্থক্য দেখাও :** (ক) শশা ও আলু (খ) চোখ ও জিভ (গ) লোম ও পালক (ঘ) টেলার ও ড্রাইভার

(১১) (ক) জলে সাঁতার কাটে এমন একটা জন্তুর **ছবি আঁকো**, (খ) গাছ থেকে গাছে লাফ দিয়ে যায় এমন একটা জন্তুর **ছবি আঁকো**, (গ) গরমকালে খাও এমন একটা ফলের **ছবি আঁকো**, (ঘ) মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি ছাওয়া একটা বাড়ির **ছবি আঁকো।**

(১২) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির ওপর ২-৩টি বাক্য লেখো :**

স্কিপিং , সাবান, রক্তাল্পতা, ইন্দ্রিয়, ব্যায়াম, হনুমানের বুদ্ধি, শিম্পাঞ্জি, ডুবোজাহাজ, আনাজ, হজম, বিষফল, আগুন, জাহাজ, শিকার, সুতির পোশাক, পোশাক বোনা, মানচিত্র, টালি, টিন, সিমেন্ট, ইট, জলের পাম্প, ঝড়, বন্যা, তাঁবু, কোমরে ব্যথা, পরিবার, ঠিকানা, পোস্ট-কার্ড, জীবিকা, আকাশের রঙ, ছায়া, সূর্য, চাঁদ, তারা, মেঘ, বৃষ্টি, স্বাস্থ্য, জলপান, ধোঁয়া, শ্বাসকষ্ট, উর্বর মাটি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জল, মাটি, পুকুর, বাঁশ, কৃষি সম্পদ, সিগন্যাল, জেব্রা-ক্রসিং, নেলকাটার, ব্লেড, মোমবাতি, ইস্ত্রি, পেরেক, মাটির উনুন, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, নাড়ি, নিশ্বাস, মেডেল, পাহাড়, বিদ্যুৎ, সকাল, সন্ধ্যা, ঘন্টা, কম্পিউটার, পালকি, ফটোকপি, দোকান।

(১৩) এই বইয়ের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠার ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখান ও ছবির বিষয়ে তিনটি বাক্য লিখতে বলুন :

পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৪, ৭, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮,৩৫,৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১২০, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২

(১৪) নীচের শব্দ ঝুড়িতে নানাধরনের শব্দ দেওয়া আছে। কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলিকে তালিকাভুক্ত করো।

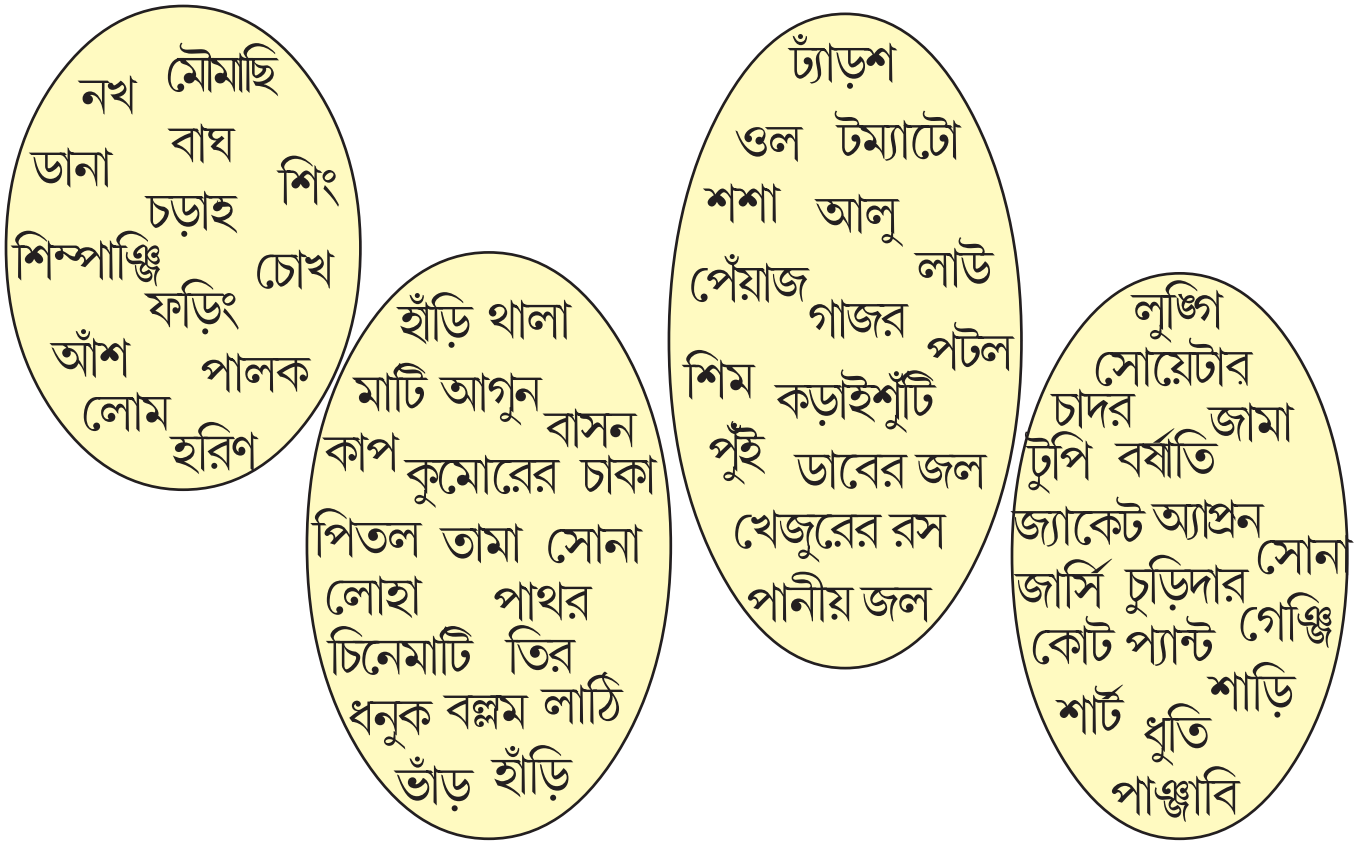

শিখন পরামর্শ

স্বাগত, বন্ধুরা। আসুন, আমরা সবাই মিলে শিশুদের শেখায় সাহায্য করার পথ খুঁজি।

শিশুরা শৈশব থেকেই শিখছে। পরিবারে, পাড়ায়, নিকট আত্মীয়দের কাছে। অনেক কিছু তারা শুনেছে। কিন্তু ঠিকঠাক বোঝেনি। ধারণা জন্মেছে, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। তাই তাদের কৌতূহল জন্মেছে। এই আবছা ধারণাগুলোকে তাদের জ্ঞানে পরিণত করায় কিছু সাহায্য দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই তা এক ধাপে হবে না। তার একেবারে প্রথম ধাপ হোক এই বই।

শিশুরা রোজই তাদের মতো করে নতুন ধারণা গড়ে নিচ্ছে। তারই মধ্যে অল্প হলেও কিছু বিষয়ে তাদের ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে। সেগুলো ভুল কিনা তা তারা ভেবে দেখেনি। ভুল-ঠিক বিচার করা না শিখলে তার ভবিষ্যৎ জীবন নানা সংশয়ে জটিল হবে। কীভাবে যুক্তি-তথ্য দিয়ে ধারণা যাচাই করতে হয়, এটা ভাবতেও তাদের সাহায্য দরকার। আমরা তাদের বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে সে বিষয়েও তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।

অনেক বিষয়ে শিশুদের কোনো ধারণাই গড়ে ওঠেনি। অথচ তার আগামী জীবন আনন্দময় করতে সেসব বিষয়ের ধারণা জরুরি, জ্ঞান থাকা দরকার। সেই বিষয়গুলো নিয়ে সে ভাবতে শুরু করুক, ধারণা লাভ করা শুরু করুক, এটা আমরা সবাই চাই। কীভাবে তাকে ভাবতে উৎসাহিত করা যায়? এবিষয়ে আমাদের সম্মিলিত ভাবনা উঠে আসা দরকার।

> '..... ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে।'
>
> **'শিক্ষার হেরফের', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯২**

আমাদের পরিবেশ

অনুকূল পরিবেশই সভ্যতার ভিত্তি

আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। তাদের ভাবনায় এই ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এজন্য পরিবেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কীভাবে বর্তমানের পরিবেশ গড়ে উঠল সে ইতিহাসও জানতে হবে। আগামীদিনে পরিবেশ ভালো রাখার জন্য কী করণীয় তা বুঝতে হবে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সেই বোধ প্রয়োগ করতে হবে।

ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ও পাঠ্যবইতে এই বোধের সমগ্রতাকে ভাঙার একটা প্রথা অনেকদিন থেকে চলছে। কিন্তু শিশুর কাছে তার পরিবেশ একটা সমগ্রতা নিয়ে আসে। তার বর্তমান সেখানে তার অতীত ও আগামীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ইতিহাস মিশে যায় ভূগোলে, পরিবেশ মিশে যায় বিজ্ঞানে। এই মিলমিশের মাঝে রয়েছে শিশুর কৌতূহল মেটানোর অফুরান সম্ভার। সেই কৌতূহলজাত ভাবনাচিন্তা তখনই বলার সুযোগ দরকার। বিষয়ের খণ্ডন তার শিক্ষাকে প্রাণহীন অঙ্গসমষ্টিতে পরিণত করে।

তাই *আমাদের পরিবেশ* বইতে একটা সমগ্রতা রাখার চেষ্টা। নানা বিষয়ে পরিবেশকে ভাঙা হয়নি। শিশুর সীমাহীন কৌতূহলকে বিষয়ভুক্ত বৃত্তের আটকে রাখার থেকে বিরত থাকার সচেতন প্রয়াস হয়েছে। শিশুমনে সবার আগে যে প্রসঙ্গগুলি জরুরি হতে পারে, সেগুলিকে নির্ভর করে তাকে নানা বিষয় নিজে নিজে শেখায় সাহায্য করার চেষ্টা হয়েছে।

'.... বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, ... একথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন, ...এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, ... শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা; আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পারো, কিন্তু তাহা শেখানো নহে।.....এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কি বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলা যেমন চলিয়া আসিতেছিল তাহাই চালাইতে থাকেন।'

'আবরণ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৬

তাড়নাহীন, পীড়নহীন শিক্ষা

খেলা, গল্প, আড়ি-ভাব

আনন্দের আর নেই অভাব

সব কিছুর মধ্যেই শেখার উপকরণ আছে। আর ভালো লাগলেই শেখা সহজ। ভালো লাগার সম্ভাবনাময় কিছু বিষয় আমরা বেছে নিয়েছি।

- খেলা
- নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক
- বাড়ির ও পাড়ার প্রিয়জন ও বড়োদের সঙ্গে গল্প করা

একটু পড়তে পারলে তিনভাবেই শেখায় শিশুরা উৎসাহ পাবে। আপনি (শিক্ষক/শিক্ষিকা) তাদের আরো উৎসাহ দেবেন। প্রতি পৃষ্ঠায় কয়েকজন শিশু ও তাদের শিক্ষিকার আলোচনায় একটা মূল প্রসঙ্গে নানারকমের কয়েকটা কথা আসছে। সেটাই পাঠ্য। পড়লেই মনে হবে যেসব কথা আছে তা পড়ুয়ারা ও আপনি, নিজেরাও বলতে পারতেন। ওই আঙ্গিকেই তারা ছোটো ছোটো দল করে আরো আলোচনা করুক। সেটা বোঝাতেই প্রতিটি কর্মপত্রের আগে 'দলে করি বলাবলি / তারপরে লিখে ফেলি' কথাটি বলা আছে।

নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা খুব দরকারি। দেখবেন, এই আলোচনায় কে কতটা অংশ নিচ্ছে। অনেক সময় হয়তো এই আলোচনাগুলো ক্লাসে তথাকথিত ভালো-খারাপের বৈপরীত্যে আঘাত করবে। অনেক সময়েই যে ভালো পড়তে পারে বা লিখতে পারে সে হয়তো নতুন কথা বলতে পারে না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বইতে ৪৩ পৃষ্ঠার শেষটা দেখুন। এমন হতে পারে যে, রান্না প্রসঙ্গে একজন আর কী লাগবে? আর কী করবে? – সেই নিয়ে আলোচনায় নানা কথা বলছে। অন্য একজন কিছুই জানে না। সে শুনল। এরপর লেখা। এবার দ্বিতীয়জন লিখল। প্রথমজন না দেখে লিখতে পারে না। তারটা দেখে লিখল। এতে ক্ষতি নেই। না দেখা নিয়ে তাড়না ও পীড়ন করলে যা শিখত, এতে দু-জনেই তার চেয়ে অনেক বেশি শিখবে। অভিভাবক /অভিভাবিকাদের বলবেন এদের মধ্যে কে বেশি ভালো তা নিয়ে তুলনা করলে দু-জনেরই ক্ষতি হবে।

শরীর থেকে শুরু, সাবধানতায় শেষ

কোথায় ছিলাম? কোথায় যাব? কে আমি?

শিশুর নিজের আর তার চারপাশের মানুষ ও প্রাণীদের শরীর বিষয়ক নানাকিছু ১ থেকে ২৫ পৃষ্ঠায় শেখার বিষয়। এই অংশে বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, ভূগোল -- পরিবেশের এই বিষয়গুলো মিশে আছে। রঙিন ও আকর্ষক ছবিগুলি শিশুরা দেখবে। কাউকে তার নিজের মতো দেখতে কিনা খুঁজবে। কেউ কেউ ছবিগুলি নিজের মতো করে এঁকে ফেলার চেষ্টা করবে। তাকে উৎসাহ দেবেন। কেউ খেলার মাঠ, পুকুর ইত্যাদি নিয়ে অনেক অন্য কথা বলবে। তাদের চিন্তায়ও উৎসাহ দেবেন। না-মানুষ প্রাণীদের শরীর নিয়ে নানা কথা আছে ১৯ থেকে ২৫ পৃষ্ঠায়। এই অংশে দেখবেন তথাকথিত পিছিয়ে থাকা শিশুদের কেউ কেউ অনেক জানে। তাদের সেই জ্ঞানের প্রশংসা করবেন। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। *আমিও পারি*— এই বিশ্বাস এসে যাবে। তাহলেই সে যা আগে ভালো পারত না তাও অনেকটা পারবে।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলার আছে। বইয়ের বেশি অংশটাই সংলাপধর্মী। ছোটো ছোটো দলে সেগুলি অভিনয় করতে পারে শিশুরা। অভিনয় করলে শেখা খুব ভালো হবে। কীভাবে কথাগুলো বলতে হবে, তা ভাবতে গিয়ে অর্থ ভালো বুঝতে পারবে। নতুন সংলাপ বলতে পারবে। দরকার হলে আপনি ভাষায় সামান্য পরিমার্জন করে দেবেন। স্থানীয় অঞ্চলের বৈচিত্র্যকে ধারণক্ষম এমন সংলাপ বানিয়ে নেবেন। প্রত্যেককে অন্তত একবার করে নাটকে অভিনয় করাবেন।

এরপর খাদ্য-প্রসঙ্গ এসেছে ২৬ থেকে ৫০ পৃষ্ঠায়। এই অংশের প্রথম দিকটায় বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য-র সঙ্গে ভূগোল এবং শেষ দিকটায় ইতিহাস বেশি করে এসেছে। ইতিহাসের সব আলোচনাই বর্তমানের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে কোনো বিষয় এমন, অতীতে সেটি কেমন হয়ে থাকতে পারে— এ নিয়ে চিন্তা করলে তবেই ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ হবে। তাই চিন্তার অনেক সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আগুনের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ আনা যায়। আগুন জ্বালানো যে একটা সমস্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় তা বলা হয়েছে। তারপরই বর্তমানে আগুন জ্বালানোর কথা আনা হয়েছে। আগুন জ্বালাতে পারার পর বাসনপত্রের প্রসঙ্গ এসেছে ৪৪ পৃষ্ঠায়। মানুষ কী করে প্রথম আগুন পেল তা এসেছে ৪৮ পৃষ্ঠায়। এভাবে একটু একটু করে চিন্তার সূত্র ধরিয়ে দিতে হয়। তবেই জ্ঞানগঠনের সম্ভাবনা থাকে। একবারে বেশি বলে দিলে চিন্তার সময় থাকে না। আমরা চাই শিশুরা চিন্তা করবে। বাড়িতে, পাড়ায় খোঁজখবর নেবে। নিজেদের আলোচনায় সবাই সেভাবে জেনে আসা কথা বলবে।

চিন্তা করার পর তার প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তাও মাঝে মাঝে দেখতে চাওয়া হয়েছে। একটা উদাহরণ: ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় কথোপকথনে মোটামুটি বলে দেওয়া হয়েছে বিষফল চেনার সম্ভাব্য পদ্ধতি। ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় প্রাচীনকালে আগুন ব্যবহারের পাশাপাশি পোষ্য পশুদের প্রসঙ্গও এসেছে। এখানে চাওয়া হয়েছে সে নিজে ভাবুক। পশু চিনতেও যে একই ধরনের *করে দেখে শেখার* পদ্ধতি ছাড়া উপায় ছিল না সেটা সে নিজে বলুক। এভাবে তাকে ভাবতে দেওয়াই চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার সুযোগ দেওয়া। দেখবেন, এই পর্বেও সবাই যেন কমপক্ষে একবার করে নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পায়। একাধিকবার হলে আরো ভালো।

পোশাক প্রসঙ্গ আছে ৫১ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গটাকে খানিক ভূগোলকেন্দ্রিক বলে মনে হতে পারে। তবে উপস্থাপনায় পোশাকের অর্থনৈতিক দিক এসেছে ৫৬ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠায়। মানুষের শ্রম যে মূল্যবান তা সরাসরি জ্ঞান হিসাবে শেখানোর চেষ্টা না করে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যাতে শ্রম বিষয়ে তার ধারণা গড়ে ওঠে সেজন্য চেষ্টা করা হয়েছে। পোশাকের ইতিহাস এসেছে ৫৯ থেকে ৬২ পৃষ্ঠায়। এখানেও শিশুর নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা প্রসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মতো কয়েকটা তথ্য জানানো হয়েছে। কিন্তু আসল কথা তাকে চিন্তার খোরাক দেওয়া। পোশাক প্রসঙ্গ শেষ করা হয়েছে ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় না-মানুষদের পোশাকের কথা দিয়ে। দেখবেন, নাটক যেন এই পর্বেও হয়।

পরের প্রসঙ্গ ঘরবাড়ি। ৬৫ থেকে ৯০ পৃষ্ঠায়। এখানে প্রধান নতুন বিষয় চিত্র আর মানচিত্রের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা গঠন। তারপর মানচিত্র দেখা ও বোঝা। তারপর নিজে আঁকা। এই কাজে মজা পেলে শিশুর ভূগোল শেখার ভিত অনেক মজবুত হবে। এখানেও বাড়ির দাম নির্ধারণের নানা কথা আছে। ঘরবাড়ির বিবর্তনের ইতিহাসও ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। আগের মতোই, একই ধারায়। না-মানুষদের ঘরবাড়ি বাদ দিলে পরিবেশের সামগ্রিকতার অঙ্গহানি হতো। তাই সেটাও আছে ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায়। এই পর্যন্ত পৌঁছে অনেকেই হয়তো উৎসাহী হয়ে দাবি করবে নাটকের। আপনি অন্যদেরও উৎসাহ দেবেন তাতে যোগ দিতে।

এবার পরিবার-এর কথা। ৯১ থেকে ১১১ পৃষ্ঠায়। এখানে পরিবারের শাখা-প্রশাখা, পরিবারে সবার পারস্পরিক সহযোগিতা, ঠিকানা, জীবিকার কথা এসেছে। এখানে এবং আগেও কিছু বিষয়ে শিশুকে নিজস্ব মতামত গঠন করতে বলা হয়েছে। কোন মতটা ঠিক তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। দেখবেন, কোনো পক্ষপাত যেন প্রকাশ না পায়। নানা পরিস্থিতির কথা আসুক। কচিকাঁচারা নিজেরা এসব নিয়ে ভাবুক। মত চাপিয়ে দেওয়া স্বাধীন শিক্ষার পক্ষে ভালো নয়। আগে শেখা ধারণা প্রয়োগ করার অনেক প্রসঙ্গ আছে এখানেও। ইতিহাস ও ভূগোল নানাভাবে মিশে গেছে। না-মানুষদের পরিবারের ধারণাও আছে। মানুষ ও না-মানুষ মিলেমিশে নানান অভিনয়যোগ্য উপাদান এখানেও আছে। যথাযথভাবে তা ব্যবহৃত হবে এই আশা রাখা হলো।

এরপর ১১২ থেকে ১৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে আকাশের প্রসঙ্গ। সূর্য, চাঁদ, মেঘ,বৃষ্টি, বজ্রপাত, রামধনু, দিগন্তরেখার কথা এসেছে। এখানে ভৌতবিজ্ঞানই মুখ্য। তবে প্রায় সবসময়েই তা এসেছে সমাজ ও পরিবেশের প্রসঙ্গ ধরে। তাই ভূগোলও বাদ যায়নি। সূর্য ও চাঁদ নিয়ে নিরীক্ষণের যে কাজের কথা বলা আছে সেটা বাস্তবে করতে সবাইকে উৎসাহ দেবেন। অনেক দিন ধরে করুক। মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবেন। শেষের দিকটা নিয়ে অভিনয় করার উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবেন। শিশুদের নতুন সংলাপ বানানোয় উৎসাহ দিন।

পরের বিষয় সম্পদ। ১৩১ থেকে ১৪৬ পৃষ্ঠা। আগে শরীর প্রসঙ্গে যা শিখেছে তা এখানে প্রয়োগ করবে। জল, বায়ু, মাটি ও আকাশ সবমিলিয়ে প্রকৃতি বিষয়েও সচেতন হবে। মানুষের সৃষ্টি করা সম্পদ বিষয়েও প্রাথমিক ধারণা পাবে। অনেক বিষয় এখানে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আছে। এখানেও অভিনয়ের হরেক উপাদান আছে। পাশাপাশি রয়েছে বিশাল প্রকৃতির নানান বিস্ময় ও রহস্যের হাতছানি। শিশুরা আরো বেশি করে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাক, শিখুক প্রকৃতির থেকে। তাদের মন-প্রাণ সজীব হয়ে উঠুক এটাই কাম্য। জল-মাটি-গাছপালার স্পর্শ লাভ করুক তারা।

শেষ প্রসঙ্গ দৈনন্দিন সাবধানতা। ১৪৭ থেকে ১৫৪ পৃষ্ঠায়। সাবধানে শহর-নগরের রাস্তা পার হওয়াও যেমন আছে, সাবধানে কোদাল চালানোর কথাও আছে। তেমনই শিশুকে ক্রমে স্বনির্ভর হতেও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শেষ পর্বে বিপন্ন বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা আছে।

১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে রংবাহার— তাতে আছে পাঁচটি ছবি। নিজেদের চারপাশকে নানা রঙে দেখে শিশুরা। সেইসব রঙেই তারা রঙিন করে তুলুক ছবিগুলো।

১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায় মূল্যায়নের রূপরেখা দেওয়া হলো।

বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কর্মপত্র রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ওই কাজগুলো কীভাবে সম্পন্ন করছে আপনি সেগুলি নথিভুক্ত করুন। এবং তার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করুন। এভাবেই হতে পারে শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন (CCE)।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্নরকম পারদর্শিতা বুঝতে প্রতিটি পাঠের পর দেওয়া কর্মপত্র নানাভাবে আপনার কাজে লাগবে। শিশুরা আলোচনায় ও পরীক্ষা করায় কীভাবে অংশ নিচ্ছে দেখবেন। কে কী লিখছে দেখবেন। কারোর লেখা ভুল বলবেন না। তবে যা দেখছেন সে বিষয়ের তথ্য আপনি সংরক্ষণ করবেন। কীভাবে সংরক্ষণ করবেন তা আপনারা ভাবুন। নিজের স্কুলের ও বিভিন্ন প্রতিবেশী স্কুলের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। প্রথমে পারদর্শিতার কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। সেই বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণে অভ্যস্ত হওয়ার পর আরো কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। এভাবে আপনাদের পর্যবেক্ষণ সংবলিত যে নথি তৈরি হবে তা শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।